সাধু-সন্তদের মনের কথা

এম. এন. রায় (ভাষান্তর ঃ যুগলকান্তি রায়)

[অনুবাদকের কথা: মাবেন্দ্রনাথ রায়ের (এম. এন. রায়) Science And Superstition—বইটির দ্বিতীয় নিবন্ধ 'Psychology of the Seer'-এর এটি বঙ্গানুবাদ। প্রথম নিবন্ধটি 'আত্মার দেহান্তর' নামে সেখানে দিল্লির একটি মেয়ে শান্তি দেবীর 'জাতিস্মরতা' -কে কেন্দ্র করে মানবেন্দ্রনাথ যেমন জন্মান্তরবাদ, জাতিস্মরণা, আত্মার অস্তিত্বের অসারতা প্রতিপন্ন করেছেন, এখানে তেমনি এক মার্কিন মহিলার 'সমাধিলাভের দাবী'কে কেন্দ্র করে মুনি-ঋষি, গুরু-বাবাদের 'অলৌকিকত্ব'কে মনোবিজ্ঞানের নিয়মে বিশ্লেষণ করেন।]

ধার্মিকতা ভারতের একচেটিয়া নয়। অন্যান্য দেশের চেয়ে এদেশেই এর ব্যাপক প্রসার; কেননা এখানে মানুষের অজ্ঞতা এত বেশী যা অন্য সভ্য দেশে নেই। অজ্ঞতার সঙ্গে ধার্মিকতার একটা সহজ যোগ আছে। তা ছাড়া, ধমীয় আচরণ একটা অনুশীলিত অভ্যাস। একারণে একজন শিক্ষিত মানুষ চাইলে কুসংস্কারে বিশ্বাস ঝেড়ে ফেলতে পারে তারও এই অভ্যাস থাকতে পারে। এটা কেউ স্বেচ্ছায় বেছে নেয় না। এটা একটা মনস্তাত্বিক ব্যাপার, এর একটা আকর্ষণীয় ইতিহাস আছে। আত্মা, মন অথবা ব্যক্তিত্ব একটা স্থির সত্তা নয়। যে কোন অভিজ্ঞতা ভিত্তিক বাস্তবতার মতে এক একটা স্বাভাবিক ইতিহাস আছে। যে কোন মুহূর্ত এটা অতীত অভিজ্ঞতার একটা সামগ্রিক ফল; এর অধিকাংশটাই অবচেতন ভাবে থাকে। অবচেতন মনে যে ছাপ ও দাগ কাটে তা আবেগপ্রবণ বা আধ্যাত্মিক জীবনকে অনেকটাই প্রভাবিত করে। তার থেকেই মানসিক আচরণে আধিদৈবিক রূপ দেখা যায়।

যে সময় আত্মার দেহান্তরে বিজ্ঞানীদের অবিশ্বাসে শান্তি দেবীর গল্প সজোরে ধাক্কা দিল সে সময়ে আমেরিকার একটি সাময়িক পত্রে আমি 'আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা'-র একটি কাহিনী পড়লাম। সেক্ষেরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিটি হল দারুণ জড়বাদের ঐ জঘন্য দেশের একটি বালিকা। তা সত্ত্বেও, ঐ গল্পে জানলাম কিভাবে ধর্মীয় আচরণ অনুশীলন করা যায় এবং পূর্বের বদ্ধমূল ধারণা থেকে আধিদৈবিক ধর্মীয় অভিজ্ঞতা প্রকাশ পায়, স্ব-সম্মোহন থেকে বেশি রহস্য জনক নয়। ভারতের এসব খুবই পরিচিত ব্যাপার। কিন্তু সেগুলিকে মনোবিদ্যা ও মানসিক রোগের চিকিৎসার গবেষণায় কদাচিৎ সূক্ষ্মভাবে বিশ্লেষণ এবং নথিবদ্ধ করা হয়। ঐসবে অতিপ্রাকৃতে বিশ্বাসের মধ্যেই কুসংস্কার প্রকাশ পায় এবং সেগুলি ধার্মিকতাকে বলীয়ান করে। এর মধ্যে শুধু অশিক্ষিত সহজ-বিশ্বাসীরাই নয়, প্রায়ই শিক্ষিত সংশয়বাদীরা থাকে।

মার্কিন বলিকাটির অভিজ্ঞতার কাহিনীও কুসংস্কারের একটি উদাহরণ: এটিও একটি ধার্মিকতার অনুশীলিত অভ্যাস। ভারতের চেয়ে আলাদা একটা সামাজিক পরিবেশ ঘটনাটি হওয়ার ব্যাপারটির বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ হয়েছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও ঘটনাটির বৈজ্ঞানিক-বিচারের সামনে পড়েও মেয়েটির এবং অনুরূপ আর সকলের অনুশীলিত ধার্মিকতা অন্ধবিশ্বাসের মধ্যেই অবিচল থেকে গেল। একারণে মার্কিন মেয়েটির এই বিবরণ আমি শান্তিদেবীর গল্পের 'বৈজ্ঞানিক যাচাই' -এর সমালোচনার একটি সংযোচজন হিসেবেই গ্রহণ করব।

ফোর্ড মোটর ওয়ার্কস -এর এক মধ্যবয়স্ক কর্মী তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর সতের বছর বয়সের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে একটি পুনরভ্যুদয়বাদী সভায় গিয়েছিলেন। পুরো পরিবারই গির্জার উপাসক মণ্ডলীর অন্তভুক্ত ছিল। ঐ বিশেষ সভায় ভগবদ্বাক্যপ্রচারকের ধর্মোপদেশ ছিল ঃ ''আমি আমার সত্তাকে শেষদিনে উজাড় করে দেব, এবং যুবকেরা ভবিষ্যদ্বাণী করবে, তরুণীরা স্বপ্নে বিভোর থাকবে।''

সময়টা ছিল শীতের সন্ধ্যা; আবহাওয়া ছিল ভিজে-ভিজে এবং ঠাণ্ডা। মেয়েটির শারীরিক দুর্বলতার কথা ভেবে তার বাবা-মা তাকে সঙ্গে নিতে চান নি। তিন তিনবার নিউমোনিয়ায় ভুগে মেয়েটি বেশ দুর্বল হয়েই পড়েছিল। মেয়েটি কিন্তু না গিয়ে ছাড়বে না, সে উপাসনাগৃহে যাবেই। সে বিশ্বাস করত তার জীবনে একটা বড় ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে। গির্জায় যাওয়ার পথে সে অতি উৎসাহে এরকম ঘোষণাই করেছিল। স্পষ্টতই, সে স্থির নিশ্চিত ছিল যে ঐশ্বরিক সত্তার নাগাল পাবেই এবং স্বপ্নাবিষ্ট হবেই।

এ ধরণের উপাসনা সভায় যেমন হয়, যেই যাজক সেই সভাকে আবেগতাড়িত করে একটা উন্মাদনা সৃষ্টি করেছেন অমনি মেয়েটি দ্রুত বেদীর দিকে ছুটে গিয়ে মুহূর্তের মধ্যে মূর্চ্ছিত হয়ে যায়। বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্রে যাকে স্বর্গসুখ, সমাধি, দশা ইত্যাদি বলা হয় মেয়েটি সেরকম ভাববিহ্বল হয়ে পড়ে। সেদিন সারারাত ধরে গির্জায় ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা চলে। শেষ পর্যন্ত সংজ্ঞাহীনা মেয়েটিকে তার বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সে দিনের পর দিন ভাব সমাধিতে থাকে। তার বাবা-মা তাকে হাসপাতে নিয়ে যেতে চান নি। তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল, পরমাত্মার সান্নিধ্য তাঁদের মেয়েটি পেয়েছে। বিস্ময়াবিষ্ট বাবা বেশ আবেগভরেই বলতে থাকেন তাঁদের মেয়ের শরীরের পাপপঙ্কিল প্রকৃতির মৃত্যু হয়েছে, উদ্ভব হয়েছে এরকম সমাধি অবস্থা।

চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন মেয়েটির শরীরের পাপপঙ্কিল প্রকৃতির মৃত্যু হয়েছে, উদ্ভব হয়েছে এরকম সমাধি অবস্থা।

চিকিৎসকরা জানিয়েছিলেন মেয়েটির জীবন বিপন্ন নয়, তাঁরা পরীক্ষা করে দেখেছেন দুশ্চিন্তার কোনো

সৃষ্টিসন্ধান

কারণ নেই শারীরবৃত্তীয় ক্রিয়ার কোনো গণ্ডগোল নেই। নাড়ী স্বাভাবিক, প্রতিবর্তী ক্রিয়াও সন্তোষজনক। কিন্তু মানসিক রোগের চিকিৎসকরা বলেছেন, মনস্তাত্ত্বিক দিক থেকে (যা ভৌত প্রতিবর্তী ক্রিয়া থেকে একেবারে আলাদা) মেয়েটি শুধু ধর্মীয় উদ্দীপনাতেই সাড়া দিয়েছিল। যেমন, যখন কোনো প্রার্থনা স্তোত্র গাওয়া হয় তখন মেয়েটির নাড়ীর গতি দ্রুত হয়। তাকে যখন জিজ্ঞেস করা হয় ভগবানকে সে ভালেবাসে কিনা বা তার সান্নিধ্য সে পেয়েছে কিনা তখন তার চোখে-মুখে মৃদু হাসি দেখা যায কিন্তু এমনিতে তার মুখচোখ থাকে এক্কেবারে ভাবলেশহীন। প্রার্থনায় মনোনিবেশ করার জন্য যাজক আহ্বান জানালে মেয়েটি কাতর আবেদনের ভঙ্গিতে তার দুটি দৃঢ় হাত তোলে, কিন্তু কোনো উদ্দীপনায় তার শরীরের বাকী অংশে কিছুমাত্র সাড়া নেই। সেই ঐভাবে চল্লিশ মিনিট হাত তুলে রাখে ; কিন্তু ঐ প্রার্থনা সভার বাকি সকলে যদিও তারও ভাববিহ্বলতায় আছে তবুও তারা দশমিনিট কি তারও কমে এভাবে থাকতে ক্লান্ত বোধ করেছে যা সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। যাজক ঘোষণা করলেন এটা একটা 'অলৌকিক' ব্যাপার—ঈশ্বরের সান্নিধ্যলাভে অতিপ্রাকৃত শক্তিরই প্রকাশ। ঐ সমাবেশের সকলে অবশ্যই তা বিশ্বাস করে ভাবাবেশে প্রার্থনা করে যেতে থাকল।

একশ তেতাল্লিশ ঘন্টা ধরে ঐরকম 'ধর্মাবেগে' সংজ্ঞাহীন অবস্থায় থাকার পর ষষ্ঠ দিনে মেয়েটি শেষ পর্যন্ত জেগে উঠে বলল, ''আমি যে মেঘের উপর দাঁড়িয়েছিলাম, পৃথিবী ছিল নিচে। আমি দেখলাম ঈশ্বর শ্বেতশুভ্র পথ ধরে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন, আমার চোখের সামনে তখন স্বর্গ।'' সে দাবী করল সে যাজকের অতি সম্প্রতি মৃত ছোট্ট ছেলেকে দেখেছে ''বিশুদ্ধ শ্বেত পোষাক পরিহিত ঐ ছেলে ঐ পথের ফুল তুলছে।''

এখন এটা একটা অলৌকিক অভিজ্ঞতা যা এই দেশে শুধু একটা ক্ষুদ্র মানব গোষ্ঠীকে নয়, সমস্ত মানুষেরই ধার্মিকতা বাড়িয়ে তুলবে। শিক্ষিত মানুষেরা এই ঘটনাকে আর একটা অতিপ্রাকৃত সত্য এবং বাস্তবতার অকাট্য প্রমাণ হিসেবে নেবেন যা তাঁদের মতে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের নাগালের বাইরে। মেয়েটির যে আগে থেকেই স্ব-সহোন-এর বাতিক ছিল, তা কুসংস্কারগ্রস্ত মন এবং তাঁর ক্ষীণ শারীরিক অবস্থা যার ফলে হিস্টিরিয়ার মতো অস্বাভাবিক স্নায়ুরোগের সম্ভাবনা থাকে, সর্বোপরি তার সাধারণ আধ্যাত্মিক অনগ্রসরতা—এসবকে একেবারে মাথা না এনে তাকে একজন ভবিষ্যদ্ দ্রষ্টা ঋষি, সাধু, ''মুক্ত সত্তা'' হিসেবে পুজোর বেদীতে বসানো হবে এবং ঐ সমস্ত মানুষ সেই আসন থেকে ভক্তদের ভবিষ্যদ্বাণী দেবে এবং নির্দেশ দেওয়ার অধিকার পাবে। তার শিষ্যবর্গের মধ্যে বেশির ভাগই হবে শিক্ষিত মানুষ। কেননা, অজ্ঞ মানুষেরা তাদের ঐতিহ্যগত ধার্মিকতার প্রভাবেই 'সক্রিয়ভাবে ধার্মিক' নয়। একেবারে প্রাথমিক ও উপর উপর ভাবে শেখা আধুনিক শিক্ষাও যে এই বিশ্বাসকে নড়বড়ে করে দিতে পারে তার কোনো তোয়াক্কা না করে তাঁরা [শিক্ষিত মানুষেরা] তাঁদের বিশ্বাসকে বিচার করার দরকারই মনে করেন না। উন্নত আধুনিক দেশেও ধর্ম এখনও যথাযথ পরিবেশে অজ্ঞ, অল্প-শিক্ষিত, অল্প মেধা ও হতাশাগ্রস্থ মানুষদের মধে নিজেকে চাগিয়ে তোলে। ওখানে আধুনিক শিক্ষার সুফল যারা পায় নি এবং নিদারুণ জীবন-যুদ্ধে যারা পরাস্ত তারাই কেবল ধর্মীয় মানসিকতার চর্চা করে। ভারতের আধুনিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অবাধ ধর্মীয় পুনরুত্থান দেখা যায়। তাঁদের কাজে কর্মেই ধর্মীয় মানসিকতা বেশি করে পুষ্টিলাভ করে। একারণেই অলৌকিক অভিজ্ঞতা—তা নির্ভরযোগ্যই হক বা প্রতারণামূলক হক আধুনিক বুদ্ধিজীবীদের নজরে এলেই তা দারুণ প্রচার পায়, নইলে ব্যাপক কুসংস্কারের অন্ধকারে সকলের অগোচরেই হারিয়ে যেত।

একজন অশিক্ষত মানুষের অলৌকিক অভিজ্ঞতার দাবীর কাছে পরবর্তীকালে স্বামী বিবেকানন্দ নামে খ্যাত হয়েছেন এমন একজন প্রতিভাবান তরুণের সন্দেহ প্রবণতা সব এই নিমেষে দূর হয়ে গেল। অথচ, ঐ 'অলৌকিক অভিজ্ঞতা'কে যদি মনোরোগ বিশেষজ্ঞদের বিচারের সামনে ফেলা হত তাহলে দেখা যেত একটি [পূর্বকথিত] আমেরিকার মেয়েটির অভিজ্ঞতারই অনুরূপ একটি ঘটনা। দুটি ক্ষেত্রেই ইশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিগত সান্নিধ্যের দাবী করা হয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই দাবীর আন্তরিকতা বুঝতে বিজ্ঞানের কোনো অসুবিধে হয় না। তবে, দুটি অভিজ্ঞতারই পটভূমি যে কুসংস্কার বিজ্ঞানের চোখে তা স্পষ্ট। একারণেই 'অভিজ্ঞতা' দুটি ব্যক্তিসাপেক্ষ হিসেবে প্রামাণ্য হলেও, এর বিষয়গত সত্যতা নেই। এটা একটা মানসিক অনুভুতি বিলোপ, স্ব-সম্মোহন বা বাস্তবতার সঙ্গে স্নায়বিক লড়াই।

পূর্ববর্তী ধারণা থেকেই অলৌকিক অভিজ্ঞতা হয়। করো কারো ক্ষেত্রে কিছু পূর্ববর্তী ধারণা দিয়েই মন বোঝাই করে দেওয়া হয়েছে। শারীরিক উদ্দীপনা ও স্বাভাবিক মানসিক সক্রিয়তা অবদমন হেতু বাস্তবতার সঙ্গে যে লড়াই হয় তার থেকে স্নায়বিক বৈকল্য আসে। আপাত দৃষ্টিতে একজন স্বাভাবিক মানুষের মধ্যে সম্মোহণ করে ভিন্ন ভিন্ন ধারণা সঞ্চারিত করা যায়। অলৌকিক অভিজ্ঞতার সেটা একটা সূত্র। যে উদাহরণ গুলির কথা আগে বলা হয়েছে সেসব ক্ষেত্রেও এরকম পুর্বধারণা আছে, বলা যায় সহজাত ভাবেই। এটা যুক্তি দিয়ে খানিকটা ঢেকে দেওয়া হয়। বিশ্বাস করার মধ্যে যে দোদুল্যমান ভাব থাকে তা একজনের প্রকৃত ধর্মীয় অভিজ্ঞতার দাবীর জোরে স্থির হয় যে সম্মোহনের সাহায্যে বাকি কাজগুলি সহজে করে ফেলে। অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শনে প্রামাণ্য ঘটনাগুলিতে 'গুরু' এই কাজগুলি শিষ্যকে স্ব-সম্মোহন অবস্থায় রেখে করে। পুর্ববর্তী ধারণা যা সুপ্ত ছিল তা জেগে ওঠে।

ধর্মীয় অভিজ্ঞতার বিষয়গুলি স্বতঃস্ফূর্তই হক বা শ্রমসাধ্য অভ্যাসের ফলই হক, তা সবই কল্পনাপ্রসূত। অন্য সব বিষয়কে বাদ দিয়ে একটা বিশেষ ব্যাপারের দিকেই স্বাভাবিক মানুষের নজর টানার দাবী করা হয়। এই অভিজ্ঞতার

মধ্যে অলৌকিক বলে কিছু নেই। এটা এক ধরণের মানসিক অবস্থা যা স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই হতে পারে কিংবা অভ্যাসের দ্বারা নিজের থেকেই ভাবাবেশ সৃষ্টি করে (auto-suggestion)-হতে পারে। প্রতিটি মানসিক অবস্থাকে মস্তিষ্কের শারীরবৃত্তীয় অবস্থায় কেন্দ্রীভূত করা যায়। দেহমধ্যস্থ নিঃসরণই আবেগকে নিয়ন্ত্রিত করে। আবার, আবেগজনিত অবস্থার উপর ঐ নিঃসরণ নির্ভর করে। ধর্মীয় অভিজ্ঞতার ইঙ্গিত হিসেবে যে মানসিক অবস্থাকে বলা হয় তখন চেতন-মনন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় চলে যায় এবং অহম্ তখন অন্তজ্ঞান বা অবচেতন মনের (subconscions) স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করে। স্নায়ুরোগগ্রস্ত মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে মানসিক-অসাড়তার অবস্থায় চলে যায়। হিস্টিরিয়া একটি অসুখ, একে সাধারণভাবে ধর্মীয় অভিজ্ঞতা হিসেবে বলা হয় না। সমাধি হল মানসিক অসাড়তা যা অনুশীলনে অর্জন করা যায়। এও এক ধরণের হিস্টিরিয়া। সমাধি অবস্থায় যা দর্শন হয় তা স্বর্গীয় ব্যাপার তো নয়ই, তা বরং স্নায়বিক কল্পনা বা হিস্টিরিয়ার মানসিক বিভ্রম। সাধু সন্তরা যা চান ঐগুলি তারই মুর্তরূপ। এমনিতেই যে কোন মানুষ আন্তরিক বিশ্বাস নিয়ে যা দেখার ইচ্ছা করে, সে তাই 'দেখে'। দুরন্ত গ্রাম শিশু তার ঐ জীবনে ভূতের গল্প যা শোনে তা বিশ্বাস করে। তাই সে ঝোপ-জঙ্গলে ভূত দেখে। অলৌকিক কিছুদর্শন পেতে হলে মনের স্বাভাবিক ক্রিয়া-প্রক্রিয়াকে এলোমেলো করে দেওয়া দরকার।

মনের নাগালের বাইরে কোনো বাস্তবতার অভিজ্ঞতাকে চেতনার উচ্চরূপ বলে বিশ্বাস করা হলেও, তা আসলে একটা মনস্তাত্বিক প্রতিক্রিয়া। এটা হয় হিস্টিরিয়ায় আক্রান্ত কোন রোগীর রোগবিদ্যার (pathology) সঙ্গে যুক্ত, নয়তো বিশেষ কোনো ব্যাপারে অভিনিবেশের জন্যও হতে পারে। যে কারণেই হক না কেন তার ফলে সংজ্ঞাহীনতা বা মানসিক অসাড়তা হয়; অথবা মনস্তাত্বিক সক্রিয়তা, নতুন কোন ভাবনা ও গুরুমস্তিষ্কের মতো বৌদ্ধিক জায়গায় বিরতি আসে; পুরাতন মনন ও মস্তিষ্কের মূল দেশেই কাজ হতে থাকে। অপরপক্ষে, যথাযথ অর্থবহ শব্দের অভাবে যদি বলা যায় বিশুদ্ধ মানসিক প্রক্রিয়ার উপরই প্রাধান্য বিস্তার করে আরো আদিম ও স্নায়ুসংস্থার জৈবিক ক্রিয়া। (এই পদটি অশুদ্ধ, ভুল পথেও চালিত করে, কেননা শুদ্ধতম মানসিক সক্রিয়তাও স্নায়ুবিক শক্তির ব্যয়েই হয়। এই শক্তি নিঃসারিত হয় বাইরের উদ্দীপনা থেকে, নয়তো শরীর মধ্যস্থ পারস্পরিক উত্তেজনা থেকে)।

মানুষের যুক্তিসম্মত ক্রিয়াকলাপ তার নতুন মানসিক অঞ্চলেই ঘটে। মস্তিষ্কের সেই অংশটি যখন অসাড় থাকে তখন সমস্ত বৌদ্ধিক নিয়ন্ত্রণ এবং মনস্তাত্বিক প্রক্রিয়ার পথনির্দেশ উহ্য হয়ে যায়। স্নায়বিক পরিবর্ত ক্রিয়া এবং পারস্পরিক উত্তেজনায় মনের মধ্যে যে নানা রকম ছবির অনবরত পরিবর্তন হয় তার সঙ্গে অহম্-এর একটা সংঘাত হয়। তখন যুক্তি-বুদ্ধির ক্রিযা বন্ধ থাকে, মনটা সাংস্কৃতিকভাবে এবং জৈবিকভাবে আদিম অবস্থায় ফিরে যায় যা কুসংস্কারেই আচ্ছন্ন থাকে। অজ্ঞতার ফলে মনে মধ্যে যে ছবিগুলি ভেসে ওঠে তাকেই অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তব বলে মনে হয়। অবদমিত দৈহিক উত্তেজনা, ইচ্ছা অলৌকিক রূপে এবং স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাসে বা সমাধি অবস্থায় দেখা যায়।

স্বর্গীয় অভিজ্ঞতায় মানুষ যে স্বর্গসুখের আবেশে থাকে তখন সচেতনতার ঊর্ধ্বে ওঠার পরিবর্তে নিম্নস্তরের আধ্যাত্মিকতায় নিমজ্জিত হয়। তত্ত্বটা হল এই যে, সচেতন মনের সমস্ত ক্রিয়া তখন মানুষের মধ্যে অতি-মানব হওয়ার উপলব্ধির শর্ত হিসেবে থাকে না। এখন, আধুনিক মনোবিজ্ঞান বলে যে, মস্তিষ্ক অসাড় অবস্থায় থাকলে সচেতন মানসিক ক্রিয়া স্তব্ধ হয় এবং সে কারণেই আরও আদিম মানষিক অবস্থা ফিরে আসে। এর ফলে জৈবিক পরিবর্তন ক্রিয়ারই প্রাধান্য হয়। এরকম অবস্থায় মানুষ ভগবানের চেয়ে জন্তু-জানোয়ারেরই কাছাকাছি আসে। সচেতন মনে অবদমনে তখন ঐশ্বরিক শক্তি হিসেবে যা প্রকাশ পায় বলে বলা হয় তা প্রকৃতপক্ষে আর যাই হক, ঐশ্বরিকও নয়, রহস্যজনকও নয়। এটা হল সেই জীবনীশক্তি যা মানুষ জীবজগতের অন্যান্যদের সাথে ভাগাভাগি করে থাকে; সেটা হল ভৌতশক্তিরই একটা রূপ। মানুষ কৃষ্টিগতভাবে অন্যান্য প্রাণীর চেয়ে উন্নত; কেননা, মানুষের মধ্যে যে মনস্তাত্বিক প্রক্রিয়া আছে তা সমগ্র জীবজগতে ক্রিয়াশীল জৈবিক নিয়মের ঊর্ধ্বেও কাজ করে। সচেতনতা আসার আগে জীবন একটা 'জান্তব' শক্তি, 'স্বর্গীয়' তো দূরের কথা, মানবিকও নয়।

'শক্তি'কে জীবন থেকে যদি আলাদা কিছু ভাবা হয় তাহলে সেটা একটা 'নামকরণ' ছাড়া কিছু নয়, এটা কল্পনামাত্র। মানুষের জীবন এবং মন ছাড়া অন্য কোনো প্রায়োগিক বৈশিষ্ট্যের বল (force) নেই। আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা অবশ্যই প্রায়োগিক (empirical) বৈশিষ্ট্যের হতে হবে, অন্যথায় এ সম্পর্কে কথা বলাটা অর্থহীন। 'যোগ' -এ যেখানে আত্মা থেকে এমন কি 'মন' থেকেও জীবনকে (প্রাণ) আলাদা করে ভাবা হয়, সেখানে গীতায় তাদের অভিন্ন রূপে গণ্য করা হয়। হিন্দু দর্শনের বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে গীতায় একটা সমন্বয় সাধন করা হয়েছে বলে ভাবা হয়। [গীতার] দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, ''জীবন কোনো কিছু বিনষ্ট করতে পারে না, তাকেও বিনষ্ট করা যায় না।'' এখানে স্বষ্টতই জীবন মানে আত্মা। পরের কথাগুলিতে বিষয়টা আরো পরিষ্কার হবে; দেখা যাবে এই গুণ আত্মাতেও আরোপ করা হয়েছে। যেমন, ''আত্মার জন্ম নেই, বিনাশ নেই ইত্যাদি ইত্যাদি।'' আত্মার ধারণা বাস্তবিকই সর্বপ্রাণবাদমূলক (animistic)। এর অস্তিত্ব জৈব ঘটনা থেকেই নির্ধারণ করা হয়। সেজন্যে ঐশ্বরিক 'শক্তি'-ও যা, জীবনও তাই। আধুনিক বিজ্ঞান জীবন সম্পর্কে সব রহস্যের নিরসন করেছে। 'শক্তি' সুতরাং একটি 'জান্তব বল' মানুষের মধ্যে যার উত্তরণ ঘটেছে যুক্তি ও বুদ্ধির কৃষ্টিগত রূপে। সুতরাং ধর্মীয় অভিজ্ঞতা হল মানুষের মধ্যে যে পশু

প্রকৃতি আছে তারই অভিজ্ঞতা। এটা ঘটে রোগবিদ্যাগত (pathological) অবস্থার জন্য; স্বতঃস্ফূর্তভাবে এর প্রকাশ না হলে অভ্যাসের দ্বারাও এই অভিজ্ঞতা লাভ করা যায়। মানুষের মধ্যে পশু প্রবৃত্তিগুলি জেগে ওঠে। তখন কুসংস্কারটাকেই উদ্ঘাটিত সত্য হিসেবে ভাবা হয়। অজ্ঞানতা থেকে যে মানসিক রূপ জন্ম নেয় তাই এমন অতিপ্রাকৃত বাস্তবতার রূপ নেয়। আগের থেকেই যেসব ধারণা মনের মধ্যে আছে তা আরও পাকাপোক্ত রূপ নেয়। বিশ্বাস থেকেই নানা ঘটনা তৈরি হতে থাকে।

কৃত্রিমভাবে অবচেতন অবস্থা সৃষ্টি করলে অহম জীবনের যন্ত্রবৎ সক্রিয়তার অভিজ্ঞতা পায়। স্নায়ুতন্ত্র মানসিক-জীবন-এর ভিত্তি; এই স্নায়ুতন্ত্রের প্রতিবর্ত ক্রিয়া মানসিক নয়, বরং জৈবিক। মানুষের মধ্যে যে ঐশ্বরিক শক্তির মুক্তপ্রবাহ আছে সচেতন মন যদি সেই অভিজ্ঞতা লাভে বাধা বলে মনে হয় তাহলে একে বুদ্ধিহীন জীবনের পশুশক্তি থেকে আলাদা করা যায় না। বুদ্ধিবৃত্তিই নিম্ন শ্রেণীর প্রাণী থেকে মানুষকে পৃথক করে। একটি সচেতন মনের কাজ। সুতরাং সচেতন মনের অবদমণে অতিমানব নয়, উপ-মানবের মানসিককতায় হাজির হয়। অতি-সচেতনতা একটি কাল্পনিক কথা যা আসলে অব-চেতনতারই নামান্তর। আধুনিক জীববিদ্যার যেভাবে অগ্রগতি হয়েছে তাতে অধি প্রাণবাদ মাথা তুলতে পারবে না। বার্গসন যে সকল জীবের মধ্যে বিদ্যমান 'জৈব প্রাণশক্তির' কথা বলেছেন বা ড্রাইয়েস্ক যে 'বোধের' কথা বলেছেন এর কোনোটাই হিন্দু অতীন্দ্রিয়বাদীর ঐশ্বরিক শক্তির চেয়ে অধিকতর প্রায়োগিক বাস্তব নয়। এই বক্তব্যের সমর্থনে কোনো প্রায়োগিক সাক্ষ্য নেই। সমস্ত সাক্ষ্যই বিপরীতমুখী। উন্নত মস্তিষ্কের উচ্চতর প্রাণী ব্যতিরেকে জীবন এক অন্ধ উদ্দীপনার মতো কাজ করে। প্রাণবাদ বিশুদ্ধ যুক্তির উপর দাঁড়িয়ে, এর কোনো তাত্ত্বিক ভিত্তি নেই। এই মতানুসারে বলা হয়, উচ্চতর প্রাণী সমূহের মানসিক প্রক্রিয়াতেই প্রমাণ হয় যে বুদ্ধি 'প্রাণশক্তি'-র একটা সহজাত ব্যাপার, এমনকি, এর যুক্তিও বিভ্রান্তিকর। যুক্তির পথ বেয়ে ক্রমশ পিছিয়ে গেলে এমন একটা ধারণায় পৌঁছানো হয় যেখানে স্রষ্টা (ঈশ্বর) ও সৃষ্টি অভেদ। এর কিন্তু কোনো বৈজ্ঞানিক সমর্থন নেই। এই সর্বেশ্বরবাদ জড়বাদের উল্টো। জগৎটা যখন একটি একক সত্তায় রূপান্তরিত হবে তাকে পদার্থ বা সত্তা পারস্পরিক পরিবর্তনে যাই বলা হোক দেহ, মন, আত্মা, বুদ্ধি, স্বজ্ঞার মধ্যে পার্থক্য তখন অর্থহীন। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা আগের থেকেই দ্বৈতবাদকে ঠাঁই দেয়। বিশ্বসত্তার সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করতে ব্যষ্টি-আত্মাকে দেহের বন্ধন থেকে মুক্ত হতে হবে। শরীর না থাকলে তার বন্ধনের কোনো প্রশ্ন থাকে না। এই যুক্তির হেত্বাভাসই আধ্যাত্মিক অদ্বৈতবাদকে একটা হাস্যকার জায়গায় নিয়ে যায়। শঙ্করাচার্য 'মায়া' -কে 'বাস্তব' বলে ঘোষণা করলেন। জগৎটা একই সঙ্গে কিভাবে প্রকৃত ও অপ্রকৃত হবে? আধুনিক পরম ভাববাদ সেই জায়গাতেই দাঁড়িয়ে ব্র্যাডলির মতানুযায়ী 'রূপ' অপ্রকৃত, কিন্তু তার অস্তিত্ব আছে। তাহলে সেখানে একটা কিছু আছে যা বিদেহী সত্তা নয়। সেটা সর্বেস্ববাদের বিরোধী। প্রাণবাদ এমন কি যুক্তির দিক থেকেও সবল নয়; কেননা এর থেকে পরস্পর বিরোধিতায় হাজির হতে হয়।

যাইহোক, এমনকি যুক্তিতেও, প্রাণবাদের জৈবিক বিবর্তনের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর কোন শক্তি নেই। উত্থানের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করে কিভাবে চেতনার প্রকাশে একটা 'নূতনত্ব'-র আভাস থাকে। কিন্তু কথা হল, প্রাণবাদেরই বক্তব্য অনুযায়ী আধ্যাত্মিক বিবর্তনের মাপে মনের স্থান স্বজ্ঞার উপরে। মন হল বুদ্ধির বিকাশ। প্রাণবাদীর মতে তা জীবনী- শক্তির মধ্যে সুপ্ত থাকে। অপরপক্ষে বলা যায়, মন হল জীবনী শক্তির উচ্চতর রূপ, উচ্চতম-ও বলা যায়। হতে পারে, উচ্চতর রূপ এখনও উদ্ভূত হতে পারে। কিন্তু এই মুহূর্তে সে সম্পর্কে আমরা কিছু জানি না। বর্তমানে সু-উন্নত মানসিক প্রক্রিয়ার নিরিখে ভবিষ্যতের কথা কেবল ভাবা যেতে পারে। সুতরাং 'শক্তি' প্রবাহ যার অভিজ্ঞতা সচেতন মানসিক প্রক্রিয়া স্তব্ধ হলে পাওয়া যায়, তা বুদ্ধির নিচে অবস্থানকারী জীবন-শক্তিরই প্রকাশ। জীবন-শক্তির মধ্যে কোনো স্বর্গীয় ব্যাপার থাকলে তার বিকাশ জীবনের উচ্চতর স্তরেই বেশি হওয়া উচিত। বুদ্ধি হল জীবনে সুপ্ত সাংস্কৃতিক বা রহস্যময় শক্তি যাইহোক না কেন তার উচ্চতম বিকাশ। সুতরাং মনের অবচেতন অবস্থাতে চলে যাওয়াকে আধ্যাত্মিক বিবর্তন বলা যায় না। এটা একটা অবক্ষয় প্রক্রিয়া। ধর্মীয় অভিজ্ঞতা (সমাধি ইত্যাদি) এক প্রকার মানসিক বিশৃঙ্খলা। কৃত্রিমভাবে এরকম মানসিক রোগগ্রস্তের অবস্থা সৃষ্টি করা হয়। সাধু-সন্তের দৃষ্টি বা ভক্তের সমাধি হিস্টিরিয়াগ্রস্থ রোগীর অলীকে বিশ্বাসের মতো একটা মানসিক ঘটনা বা বিদেহী সত্তার মাধ্যমে ভাবাবেশ।

স্নায়ুবিক বৈকল্যের কারণ ও তার আরোগ্যের আবিষ্কারের ফলে অভিজ্ঞতার রহস্যের উপর অনেকখানি আলোকপাত হয়েছে। বিখ্যাত ফরাসি চিকিৎসক চারকট হিস্টিরিয়াও সংবেশনের (hypnosis) মধ্যে একটা সম্পর্ক বের করেছেন। হিস্টিরিয়া রোগীর চিকিৎসা করতে গিয়ে তিনি দেখেছেন যে কোনো ধারণা সংবিষ্ট (hypnotisec) রোগীকে দিলে সে বিনা বাধায় তা গ্রহণ করে। আরো পরীক্ষা করে দেখা গেছে এই যে যে-কোনো ধারণায় (যা তাকে দেওয়া হয়) প্রভাবিত হওয়ায় তার প্রবণতা সংবেদন (hynosis)-এর জন্য হয় না। এটা হিস্টিরিয়ার একটা বৈশিষ্ট্যসূচক লক্ষণ। সাধারণ সুস্থ মানুষের এরকম ঝোঁক থাকলে তাকেও সংবিষ্ট করা যায়। কিন্তু হিস্টিরিয়া রোগীর মন সাধারণ - সুস্থ মানুষের চেয়ে অভিভাব -এর প্রতি বেশি খোলা, সংবেশন কৃত্রিমভাবে করা যায়। এটা সচেতন মনের কম-বেশি আংশিক বা আচ্ছন্ন অবস্থা — ঠিক রোগবিদ্যার মধ্যে পড়ে না, তার কাছাকাছিও নয়। শারীরবৃত্তীয়

ভাবে বাইরের বা ভিতরের কোনো উদ্দীপনায় স্নায়বিক শক্তির বিনিময়েই মানসিক সক্রিয়তা আছে। স্বাভাবিক অবস্থায় মন নানান্ ব্যাপারে নিয়োজিত থাকে। নির্গত শক্তির প্রবাহ নানা দিকে হয়। শক্তি যা ব্যয় হয় তা স্নায়ু-কলার কোষের সংরকি?ত ভাণ্ডার তেকে আবার ভরপুর হওয়ার সঙ্গে মস্তিষ্কের কাজেও একটা ভারসাম্য থাকে। বিশেষ বিষয়ে অতিরিক্ত মনোবিবেশের ফলে সেই ভারসাম্য নষ্ট হয়। একটি বিশেষ নিউরন গোষ্ঠী পুরো সংরক্ষিত ভাণ্ডার কাজে লাগায়। ফলে, মস্তিষ্কের অন্যান্য অংশ অত্যন্ত উততেতি হয় না, অথচ একটা বিশেষ বিষয়ে অতিরিক্ত মনোনিবেশের দরুণ তা বাইরের উত্তেজনাতেও উদ্দীপিত হতে পারে। বাইরের উদ্দীপনা ও ভিতরের উত্তেজনার অভাবে শক্তি নিঃসরণ হয় না। সাময়িকভাবে মস্তিষ্কের সক্রিয়তা বন্ধ থাকে; শুধু এক বিশেষ নিউরনগোষ্ঠী পুরো সংরক্ষিত শক্তি ব্যবহার করে নিজেদের নিঃশেষ করে ফেলে। সংবিষ্ট মানুষের মন একটি বিশেষ বিষয়ে নিবিষ্ট হওয়ার সংবেশনে (hypnosis) আংশিক জ্ঞানশূন্যতা বা আচ্ছন্নতা আসে। হিস্টিরিয়ার একটা সাময়িক পর্যায়ই হল এই সংবিষ্ট অবস্থা যা কৃত্রিমভাবে করা যায়। সেজন্য এমন কি সাধারণ - স্বাভাবিক মানুষের ও সংবেশনের ফলে অভিভাব (Suggestion)-এর প্রতি একটা প্রবণতা থাকে। তাছাড়া, তারা শুধু আপাতভাবে 'স্বাভাবিক'। তাদের বিশেষ ঝোঁক না থাকলে বা তাদের কোনো ব্যাপারে সেই আগ্রহ না সৃষ্টি করলে তাদের সংবিষ্ট করা যায় না, অর্থাৎ তাদের হিস্টিরিয়ার সাময়িক অবস্থায় আনা যায় না। এই যে ঝোঁক বা প্রবৃত্তহওয়া এটাকেও হিস্টিরিয়ার একটা লক্ষণ হিসেবে ভাবা উচিত। এটা একটা ঘটনা যে, কেবল দুর্বল চিত্ত মানুষকেই সচেতনভাবে সংবিষ্ট করা যায়, তাদের সেই দুর্বলতা যে সবসময়ে চোখে পড়ে তাও নয়।

হিস্টিরিয়া বা ঐ ধরণের প্রবণতায় দেখা যায় সম্মোহনকারী সম্মোহিত ব্যক্তির মধ্যে যে ধারণা সঞ্চারণ করেন (Suggestion বা অভিভাবন) তার ফলে মস্তিক সহ সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রের একটা সহজাত অবনতি ঘটে। অন্য ভাবে বলা যায় এটা একটা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া মানসিক অবক্ষয়ের লক্ষণ। চারকট-এর সিদ্ধান্তে ভ্যানেট-রে অনুসন্ধানে জোরালো সমর্থন পেয়েছিল। তাঁদের অভিমত হল, হিস্টিরিয়া রোগীদের একই সঙ্গে বা একই সময়ে একটা বেশি ভাবনা বা ধারণা থাকতে পারে না। সেটা মানসিক ত্রুটির একটা লক্ষণ। বিভিন্ন ধারণার সন্নিবেশ না হলে যুক্তিসঙ্গত ভাবনা সম্ভব নয়। হিস্টিরিযার লক্ষণ অবশ্য এমন সব মানুষের মধ্যেও দেখা যায় যারা আপাত দৃষ্টিতে মানসিকভাবে অসুস্থ নয়। ঐসব ক্ষেত্রে মনে একটা ব্যাপারই আগের থেকেই জেঁকে বসে থাকে। সম্মোহন অভিভাবনের দ্বারা তা দেখানো যায়। একটি ধারণা নিয়ে মন বন্ধ থাকলে, স্বাভাকিভাবে বা সম্মোহনে আবেগ বুদ্ধিবৃত্তিকেও ছড়িয়ে যায়। কেননা, মানসিকভাবে সুস্থ মনে হয় এমন বুদ্ধিমান মানুষদের হিস্টিরিয়ার লক্ষণ দেখা গেলে তার কোনো ভৌত কারণ পাওয়া যায় না। তার শরীরে স্নায়ুঘটিত কোনো নির্দ্দিষ্ট ত্রুটির জন্য হচ্ছে তাও হল ঈশ্বরের-সান্নিধ্যের লক্ষম। কিন্তু মনোবিজ্ঞানের ব্যাখ্যায় এসবকে অবদমিত আবেগের সংঘাতের ফল বলা যায়, আবার আবেগও হল একটা জৈবিক ঘটনা। মনোবিশ্লেষকরা মনের অবচেতন অংশে ঢুকে অতীন্দ্রিয় অনুভূতির কারণগুলি প্রকাশ করেন। এর মধ্যে অতীন্দ্রিয়তা সত্যোপলব্ধিরও ব্যাপার নেই; এটা কিছু অবদমিত আবেগের সংঘাতে উদ্ভূত অলীক কল্পনা মাত্র।